২৭-০৬-১৮ : প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - দেহ সহিত সমস্ত কিছুই এমন কি বর্তমানের এই পুরোনো দুনিয়াকেও ত্যাগ করতে হবে তোমাদের। যেহেতু প্রকৃত গাইড দ্বারা দিশা পেয়ে গেছো তোমরা"

প্রশ্ন :- ঈশ্বরীয় পরিকল্পনায় কোন্ এমন কর্ম-কর্তব্যের কল্যাণ লুকিয়ে আছে তাতে ?

উত্তর :- তা এক মহাবিনাশের কর্ম-কর্তব্য! যার কারণে বেহদের পুরোনো এই দুনিয়াকে ধ্বংসপ্রাপ্ত হতেই হবে। অবশ্য এই ধ্বংসের পিছেনেও কল্যাণ লুকিয়ে আছে। কিন্তু অজ্ঞানী লোকেরা ভাবে, এ তো খুবই অকল্যাণের। অথচ বাবা স্বয়ং বলছেন-"আমি যে এই জ্ঞান-যজ্ঞের রচনা করেছি, এই যজ্ঞেই বর্তমানের এই পুরোনো দুনিয়ার সমস্তকিছুই আহুতি হয়ে, আবার নতুন দুনিয়ার সূচনা হবে।"

গীত :- ওঁম্ নমঃ শিবায়ঃ .....

ওঁম্ শান্তি! বাচ্চারা গীত তো শুনলে তোমরা, কিন্তু এই গীতে কার মহিমা করা হয়েছে ? তোমাদেরই প্রকৃত মাতা-পিতা অর্থাৎ পরমপিতা পরমাত্মার মহিমা। যিনি উচ্চ থেকেও অতি উচ্চের, সর্ব্বোচ্চ ভগবানের। তিনি ঈশ্বরীয়- পিতা 'গড-ফাদার'! এই যে ঈশ্বরকে ফাদার বলা হচ্ছে - কিন্তু কাদের ফাদার তিনি ? --তিনি সমগ্র মনুষ্য সৃষ্টি জগতের ফাদার। যিনি অসীম বেহদের বাবা। ওনাকে যেখানে বাবা বলা হচ্ছে, তার অর্থ উনিই (সন্তানের) রচয়িতা। আসলে সমগ্র মনুষ্য সৃষ্টি জগতেরই রচয়িতা উনি। বাস্তবে সকল মনুষ্য মাত্রেরই দু-ধরণের বাবা থাকে- একজন (দেহধারী) লৌকিক বাবা, অপরজন পারলৌকিক বাবা, অর্থাৎ আত্মার বাবা। লৌকিক বা জাগতিক বাবার দ্বারা আমাদের আত্মার জন্য দেহ বা আকার গঠিত হয়। আত্মা কিন্তু নিরাকার। আত্মাদের নিজস্ব নিবাসস্থান নিরাকারী দুনিয়াতে। যাকে ব্রহ্মলোক বলা হয়। আর এখানে আত্মারা শরীর পায় তাদের কর্ম-কর্তব্যের পার্ট করার জন্য। তাই, অবিনাশী নাটকের এই ড্রামার রহস্যকে খুব ভালভাবে জানা উচিত। বাচ্চারা, তোমরা তো জানতে পেরেছো যে, গড-ফাদারের মহিমা অন্য সবার থেকেই পৃথক ধরণের। তাই তো তোমরা তাকে ডাকো- "ওগো ঈশ্বরীয় পিতা" বলে। মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ ইনিই। সৃষ্টি-জগতের কল্প-বৃক্ষ একটি উল্টো বৃক্ষের মতন। বীজরূপী বাবা যিনি বৃক্ষের উপরি ভাগে অবস্থান করেন। তাই, মানুষেরা যখন ওনাকে "ও গড়-ফাদার" বলে ডাকে, তখন তাদের দৃষ্টি থাকে উপরের দিকে। সকল আত্মারই পিতা সেই এক পরমপিতা পরমাত্মা। যেহেতু একমাত্র উনিই সর্ব্বোচ্চ, তাই ওনার মহিমাও তেমনি সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু মানুষেরা তা সঠিক ভাবে বোঝে না। সকল আত্মাধারীদেরই পিতা এই এক ও একমাত্র বাবা। এই বাবা হলেন নিরাকার বাবা। এছাড়াও আর একজন আছেন সাকারী বাবা, যিনি প্রজাপিতা ব্রহ্মা। যাকে আদিদেব, মহাবীর, এ্যাদম্-ও বলা হয়ে থাকে। যার মাধ্যমে নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা মনুষ্য সৃষ্টির রচনা রচান। কোনও দেহধারীর পিতাকে কখনই অসীম বা অনন্ত (জগতের) বলা যেতে পারে না। যেমন লৌকিক পিতা যেভাবে রচনা রচেন - ওনাকে প্রথমে স্ত্রী-রূপে কাউকে গ্রহন করতে হয়, তারপর সেই স্ত্রীর মাধ্যমে বাচ্চার জন্ম দেন। এই কর্ম-কর্তব্য সম্প্রদান যিনি করেন, তাকেই বাবা বলা হয়। কিন্তু এই বাবাকে কখনই সর্বব্যাপী বা অসীম-অনন্তের বাবা বলা হয় না। শরীরধারী পিতার সন্তানেরা উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার স্নেহাশীষ ও জাগতিক আশীর্বাদী যা কিছু থাকে তাও পেয়ে থাকে। তেমনি অসীম বেহদের

নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মাও সকল আত্মাদের বেহদের বাবা। এই মূল কথাটাই বুঝতে হবে এবং বোঝাতেও হবে।

ঈশ্বর এক ও একমাত্র অর্থাৎ বাবা কেবল একজনই। কিন্তু আত্মারা এখন তাদের এই প্রকৃত বাবা, পরমাত্মাকে ভুলেই গেছে। আর বাবাকে ভুলে যাবার কারণেই মানুষেরা এখন এমন অনাথ হয়ে গেছে। বাবাকে সঠিক ভাবে না জানার কারণে স্বর্গ-রাজ্যের কথা অর্থাৎ রচনার বিষয়গুলি, কিম্বা ভাই-বোনের সম্পর্ক ইত্যাদি সবকিছুই ভুলে গেছে। বাবাকে ভুলে যাবার কারণেই নিজেদের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া লেগেই আছে। যা একেবারে কাঙ্গাল অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। যেহেতু ধন-সম্পদ-আশীর্বাদ, সেসব কিছুই তো পাওয়া যায় এক ও একমাত্র বাবার থেকেই। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরও ওনারই রচনা। এই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর এনারা সূক্ষ্মবতনবাসী। আর সূক্ষ্মবতনের উপরেই আছে মূলবতন, যেখানে বাস করেন পরমপিতা পরমাত্মা। আমরা আত্মারাও সেখানকার বাসিন্দা। আত্মারা নিজেরাই একথা বলে থাকে যে, "নিরাকারী সেই দুনিয়া হলো সুইট গড্-ফাদারলী হোম"। বাচ্চারা, তোমরা তো এই বতনের বিষয়ে অবগতই আছো। বাস্তবে বতন বা লোক হলো তিনটি : মূলবতন, সূক্ষ্মবতন ও স্থূলবতন। উচ্চ থেকেও অতি উচ্চের সর্ব্বোচ্চের হলেন এই বাবা। যিনি পরমপিতা পরমাত্মা স্বয়ং 'করনকরাবনহার', 'রচনাকার' (ক্রিয়েটর) এবং 'নির্দেশক' (ডাইরেক্টর)-ও বটে। উনি সর্বাগ্রে রচনা করেন, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরকে। তারপর ব্রহ্মা দ্বারা ব্রহ্মা মুখ-বংশাবলী ব্রহ্মাকুমার ও ব্রহ্মাকুমারীদের দত্তক নেন সন্তান হিসাবে। (এই ব্রহ্মাও তিনিই-) দিলওয়ারা মন্দিরে যাকে আদি-দেব হিসাবে দেখানো হয়। স্মরণিকায় তোমাদেরকেও দেখানো হয়, (ব্রহ্মার) নীচে বসে তপস্যায় মগ্ন তোমরা। যিনি এই ভারত-খণ্ডকে এমন পতিত বানিয়ে থাকে, স্মৃতিস্তম্ভে তারও স্মৃতি-স্মারক রয়েছে সেখানে। আত্মারূপী প্রেমিকাদের সবারই এক ও একমাত্র প্রেমিক (পরমাত্মা)। মন্দিরের স্মৃতি-স্মারকে দেখানো আছে, মন্দিরের সন্মুখেই বসে আছেন (জগৎ মাতা) জগদম্বা ও জগৎপিতা। ওনারা বসে রাজ-যোগের তপস্যা করছেন। ভগবান স্বয়ং তা বলছেন- "আমি ব্রহ্মার এই শরীরে অবস্থান করে তোমাদেরকে এই রাজযোগের শিক্ষা দিয়ে থাকি যেখানে জগদম্বাও উপস্থিত থাকেন, প্রজাপিতা ব্রহ্মার সাথে ব্রহ্মাকুমার ও ব্রহ্মাকুমারীরাও উপস্থিত থাকে। তাদের সাথেই থাকে অধর-কুমারীরাও।" অথচ, মন্দির নির্মাতারা নিজেরাই জানে না যে, কারা কুমারী আর কারা অধর-কুমারী। এমন ক্ষেত্রে অবশ্য তারা জগৎ-অম্বা ও জগৎ-পিতার সন্তান হিসাবেই গ্রাহ্য হবে। বাবা স্বয়ং তাদের সবার সামনে বসে এই রাজ-যোগের শিক্ষা দিচ্ছেন।

বাবা আরও জানাচ্ছেন- কেনই বা সর্বাগ্রে তিনি ব্রহ্মাকেই রচনা করেন। যেহেতু, বাবার প্রবেশতা ঘটে কোনও এক সাধারণ বানপ্রস্থ শরীরে। তখন থেকে সে আদিদেবে (ব্রহ্মায়) পরিণত হয়। এই প্রজাপিতা ব্রহ্মাকেই আবার মহাবীর বলা হয়। কিন্তু ইনি কার সন্তান ? বাবা স্বয়ং বসে তা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছেন - "এই ব্রহ্মার দেহেই আমার প্রবেশতা ঘটে, লোকেরা আমাকে শিব নামে জানে।" আর, এমনটা ভাবারও কোনও যুক্তিই নাই যে, বাবা এখানে আসেন না। লোকেদের মুখে মুখেই তো এমন কথা হামেশাই শোনা যায়- "যদা যদা হও ধর্মস্য .....!" বর্তমানের এই সময়টাই হলো পতিত দুনিয়ার। তাই উনি না এলে এই পতিত দুনিয়াকে পবিত্র বানাবে কে ? -- একথাও তো বুঝতে হবে। তাই বাবা বুঝিয়ে বলছেন- "একমাত্র আমিই সেই সদগতি-দাতা। গঙ্গা-নদীর (জল) দ্বারা কারও গতি বা সদগতি হতে পারে না কখনও। সদগতি করতে পারেন, একমাত্র একজনই যিনি পরমপিতা পরমাত্মা। যিনি সদাই পবিত্র। অর্থাৎ যিনি 'হেভেনলী গড-ফাদার, যিনি

স্বর্গ-রাজ্যের রচয়িতা। তোমরা বি.কে.-রা যার সন্তান। অতএব তোমরা যেখানে তারই সন্তান, তবে তোমরা (উত্তরাধিকার সূত্রে) কেনই বা গড-ফাদারের কাছ থেকে স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী হবার আশীর্ব্বাদী-বর্সা নেবে না ? এটাই তো হলো বুঝদারের মতন কথা। দিলওয়ালা মন্দিরে স্মৃতি-চিহ্ন হিসাবে এসবের চিত্র ও মূর্ত্তি যেখানে রয়েছে। যেখানে দেখানো হয়েছে, ধ্যান-মগ্ন তপস্যায় নীচের দিকে তোমরাই সেখানে বসে আছো। আর উপরের দিকে আছে স্বর্গ-রাজ্যের স্মৃতি-চিহ্নের চিত্রাদি। একদা যেসব দেবী-দেবতারা এই ভারতেই ছিল। আর তাই তো বাবাকেও আসতে হয় পতিত বাচ্চাদেরকে পবিত্র বানাতে। বাবা নিজেও তা বলেন--কল্প-কল্প ধরে, প্রতি কল্পেরই সঙ্গমযুগে ওনাকে আসতে হয়। একমাত্র এই সঙ্গমযুগই হলো সর্ব শুভ-লক্ষণযুক্ত যুগ। যা (কলিযুগের অন্তিম সময় ও সত্যযুগের প্রারম্ভের মধ্যবর্তী সময়) তাই বাবা আসেন কলিযুগের অন্তে এসে সত্যযুগ স্থাপনা করেন। বি.কে.-বাচ্চাদেরকে সামনে বসিয়ে স্বয়ং (পরমাত্মা) বাবা এসব বোঝাচ্ছেন। বাবা নিজে কিন্তু জন্ম-মৃত্যুর রহিত। কোনও মনুষ্যকেই ভগবান বলা চলে না। মানুষেরাই ৮৪-জন্ম নিয়ে থাকে।

বাচ্চারা, তোমরা তো জানো, বর্তমানের এই কলিযুগ অর্থাৎ মৃত্যুলোক। আর সত্যযুগকে বলা হয় অমরলোক। বর্তমান সময়টা হলো নরকেরও অধম। এখানে একে অপরকে মারতে-কাটতেই ব্যস্ত থাকে। এই ভারত ভূখণ্ডই একদা কত পবিত্র ছিল। তখন এখানে দেবী-দেবতারা রাজত্ব করত। বাবা আসেন পতিত দুনিয়ায় পতিত শরীরেই। তবে অবশ্যই যে সত্যযুগেও ছিল, তারই অন্তিম জন্মের দেহে বাবা এসে আধার নেন তার কর্ম-কর্তব্য সম্প্রদান করতে। তাই তো একথাও প্রচলিত আছে, আত্মা পরমাত্মা থেকে পৃথক হয়ে আছে বহুকাল ...। এতেও তো তোমারা কল্প ও যুগের হিসেব মেলাতে পারো। (কল্পের) শুরুতে থাকে আদি-সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের লোকেরা। একমাত্র তারাই কল্পের পুরো ৮৪-জন্ম পায়। ইসলাম, বৌদ্ধ ইত্যাদিরা ৮৪-জন্ম পায় না। এই ভারত ভূখণ্ডই পরমপিতা পরমাত্মার জন্মস্থান। তাই অন্যান্য সব ভূখণ্ড থেকে এর স্থান সর্ব্বোচ্চে। কিন্তু এখন যে কলিযুগ। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন, এ সবই যা কিছু ঘটছে তা হচ্ছে অবিনাশী ড্রামা অনুসারে। এই ড্রামার কোনও বিনাশ নাই। সম্পূর্ণ জগতের ইতিহাস-ভূগোলের পুনরাবৃত্তি হতেই থাকে চক্রাকারে। আর যে এই স্বদর্শণ-চক্রের জ্ঞানকে বুঝে চলতে পারে, তবেই সে স্বদর্শণ-চক্রধারী রাজা হতে পারে। ভারত ভূখণ্ডে যখন দেবী-দেবতাদের রাজ্য থাকে, তখন অন্য কোথাও আর কোনও ধর্মের উপস্থিতি থাকে না। কল্পের শুরুতে নতুন ভারতের নতুন রাজধানীতে কেবল দেবী-দেবতারাই রাজত্ব করে। যাকে বলা হয় 'ওর্য়াল্ড অলমাইটী অথরিটি'-র রাজ্য। যাকে অন্যেরা কেউই কোনও প্রকারেই পরাজিত করতে পারে না। শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ তখন সমগ্র বিশ্বে রাজত্ব করে। তাদের এমন বিশ্বের মালিক বানাবার কারিগর অবশ্যই কেউ থাকবে। তিনি হলেন পরমপিতা পরমাত্মা, গড়-ফাদার। বর্তমান সময়ে তো দেবী-দেবতাদের নাম-গন্ধ বা অস্তিত্বই নেই। কেবলমাত্র দেবী-দেবতাদের মূর্তি ও চিত্রাদিই আছে। কিন্তু তাদের গুণ-শক্তি ও কর্ম-কর্তব্যের বিষয়ে কারও জানা নেই। বর্তমান সময়কালে গর্ভনমেন্টেরও কোনও ক্ষমতা নেই। এমন কি তারা তাদের নিজেদের ধর্মে (কর্ম-কর্তব্য)-এর সঠিক ধারণা নেই। অথচ প্রবাদ আছে - ধর্মই শক্তি। সেই ধর্মের স্থাপনা করার কারিগর এই বাবা। তাই তো ওনাকে বলা হয় সর্ব্বশক্তিমান 'অলমাইটী অথরিটি'। এই 'গড়-ফাদার'-ই একদিকে যেমন বাবা, আবার অন্য হিসাবে ওনাকে 'নলেজফুল টিচার'-ও বলা হয়। যেহেতু উনি আবার পতিত-পাবন, তাই আবার সদগুরুও বটে। ওনার কিন্তু কোনও বাবা নেই। যেহেতু উনি হলেন 'সুপ্রীম-ফাদার', আর 'সুপ্রীম টিচার' কারণ উনি 'নলেজফুল'। একমাত্র উনি ছাড়া আর কোনও মানুষেরই এই অবিনাশী

ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান জানা নেই। একমাত্র উনিই সবার সদগতিদাতা। ওনার কোনও গুরু-গোঁসাইও নেই। একমাত্র উনিই, যিনি অসীম-বেহদের বাবা, বেহদের টিচার, আবার বেহদের সদগুরুও বটে।

বাবা বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন, বর্তমান ভারত এখন কাঙ্গাল ও পতিত হয়ে পড়েছে। এই পতিত অবস্থা হয়েছে মায়ারূপী রাবণের কারণে। তাই ভারত এখন অসুরদের রাজস্থান (রাজত্ব)! অথচ, সত্যযুগে যা ছিল দেব-দেবীদের রাজস্থান। যাকে স্বর্গ বা হেভেন বলা হতো। আর এই ভারতই উচ্চ থেকেও উচ্চতর অবিনাশী ভূখণ্ড। এমন কি অবিনাশী বাবারও এটাই হলো জন্মস্থান। এই ভারত ভূ-খণ্ডের বিনাশ হয় না কখনও, যদিও বাকী অন্য সব ভূখণ্ডই ধ্বংশপ্রাপ্ত হয়। অতএব ড্রামার চিত্রপট অনুসারে বাবারও কর্ম-কর্তব্যের পার্ট আছে - এই পতিত সৃষ্টি-জগৎকে পবিত্র বানিয়ে আদি সনাতন ধর্ম স্থাপনা করার। সেই উদ্দেশ্যেই শংকরের দ্বারা এত অনেক ধর্মের বিনাশ হয়ে থাকে। আর এই বিনাশ কিন্তু কোনও অকল্যানের নয়। আর তা হচ্ছে রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের মাধ্যমে - যার মাধ্যমে এই বিনাশের শিখা প্রজ্বলিত হয়। বাবা আরও জানাচ্ছেন, গীতার প্রকৃত রচয়িতা উনি অর্থাৎ নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা। কিন্তু অজ্ঞানী শাস্ত্রকারেরা তাতে কৃষ্ণের নাম লিখে রেখেছে। কিন্তু এখানে ভগবান স্বয়ং বলছেন - "একমাত্র আমিই এসে তোমাদের সেই রাজযোগের শিক্ষা দিয়ে থাকি। এখন থেকে তোমরা হলে রাজযোগী। তাই দেহ সহিত সৃষ্টি জগতের পুরোনো যা কিছু আছে, সে সবকিছুকেই ত্যাগ করতে হবে তোমাদের। আমি নিজে গাইড হয়ে তোমাদের সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যই এসেছি।" এক ও একমাত্র এই বাবা-ই হলেন যাবতীয় দুঃখ-কষ্টের উদ্ধারকর্তা। অর্দ্ধেক কল্প হলো ভক্তির অর্থাৎ রাবণ-রাজ্য আর অর্দ্ধেক কল্প রাম-রাজ্য। ঈশ্বরীয় বাবা বসে ঈশ্বরীয় বাচ্চাদেরকে এগুলিই বোঝাচ্ছেন, এমন নয় যে কোনও মনুষ্য তা বোঝাচ্ছেন। পরমাত্মা বাবা তার আত্মারূপী সন্তানদের সাথেই বাক্যালাপ করছেন। বাবা বোঝাচ্ছেন- বাচ্চারা, তোমাদের এই পথ হলো প্রবৃত্তি-মার্গ। এই ভারত ভূখণ্ডে যখন পবিত্রতা ছিল, তখন শান্তি ও সমৃদ্ধিও ছিল। তা খুইয়ে ফেলায় এখন আর সেই শান্তি-সমৃদ্ধি নাই। সবাই এখানে যেমন রোগী তেমনি দুঃখী। ভারত যে এখন মহা দুঃখধামে পরিণত হয়েছে। অথচ এই ভারতই একদা সুখধাম ছিল। এখন তাই বাবা বলছেন- "বাচ্চারা, তোমারা আমার সাথেই যোগের অভ্যাস করো। আর এজন্য প্রথমে এই নিশ্চয়তা আসা দরকার যে আমি আত্মা, নিজেকে পরমাত্মা যেন ভেবো না আবার। যেমনটা সাধু-সন্ন্যাসীরা বলে থাকে, ঈশ্বর সর্বব্যাপী। কিন্তু তা কি করে হয়, পরমাত্মার মহিমা তো সর্ব্বোচ্চ ও সর্বোত্তম। এই তোমরা সবাই সত্যযুগে কত পবিত্র ছিলে। কিন্তু এখন কত অপবিত্র হয়ে আছো।

প্রকৃত অর্থে বর্ণের ধারা এই প্রকারের - ব্রাহ্মণ, দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, তাই না ! তোমরা বি.কে.-রা হলে প্রজাপিতা ব্রহ্মার ব্রাহ্মণ সন্তান। কিন্তু এই আদি-দেব ব্রহ্মাকে জন্ম দিয়েছেন কে ? এবার বাবা নিজেই তা জানাচ্ছেন, উনি যখন থেকে এই (ব্রহ্মার) শরীরে প্রবেশ করে তাকে আধার বানিয়েছেন, তখন থেকেই এনার নাম রাখা হয় ব্রহ্মা। অর্থাৎ শিববাবা স্বয়ং এই ব্রহ্মাকে দত্তক নিয়েছেন। তাই তো ব্রহ্মার এই রথ (শরীর) -কে ভাগীরথ অর্থাৎ ভাগ্যশালী রথ বলা হয়। এনার মাধ্যমেই মহাবাক্যের জ্ঞানে তোমারা মায়াকেও পরাজিত করতে পারো। যা ময়দানের কোনও স্থুল যুদ্ধ নয়। তোমরা বি.কে.-রা তো হলে অহিংসক। হিংসা প্রধানতঃ দুই প্রকারের :- প্রথম প্রকার হল - কাম-বিকারের হিংসা। দ্বিতীয় প্রকার হলো, একে অপরকে শারীরিক আঘাত করে মারার হিংসা। বাবা জানাচ্ছেন, এদের মধ্যে কাম-বিকার হলো মহাশত্রু। এর কারণেই তোমরা

আদি-মধ্য-অন্তে দুঃখ পেয়ে আসছো। অর্থাৎ দ্বাপরে যখন থেকে রাবণ-রাজত্বের শুরু হয়। আর ব্রহ্মারও রাত শুরু হয় তখন থেকেই। বর্তমানের এই সঙ্গমযুগ হলো সর্ব্বোচ্চে, অর্থাৎ সর্ব্বাধিক কল্যাণকারী যুগ। এর পর থেকে আবার তোমাদের নীচের দিকেই নামতে হবে। তখন আবার দেবতা থেকে হবে ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয় থেকে হবে বৈশ্য, এভাবেই আবারও শূদ্র-বর্ণেও আসতে হবে। আর যারা ব্রাহ্মণ ধর্মের হবে, তারা অবশ্যই আবার এখানে এসে ব্রহ্মাকুমার, ব্রহ্মাকুমারী হবে। বাবা ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছেন- একদা এই ভারত ভূখণ্ডই 'জীবনমুক্ত' ছিল, যা এখন 'জীবনবন্ধে' পরিণত। বাবা এসে সেকেণ্ডেই 'জীবনমুক্তি' দিয়ে দেন। একমাত্র এই বাবার থেকেই কল্পে-কল্পে প্রতি কল্পেই এভাবেই অসীম-বেহদের সুখের অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্সার প্রাপ্তি হয়। মুক্তি বা জীবন-মুক্তির অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্সা কোনও মানুষ অন্য মানুষকে দিতে পারে না। ভব-সাগর পার করার মাঝি বা সদগুরু কেবলমাত্র এই একজনই। তোমরা বি.কে.-রা সেই বিশ্বের রচয়িতা বাবার দ্বারাই আগামী বিশ্বের মালিক হতে যাচ্ছো।

বাবা জানাচ্ছেন- উনি নিজে নিষ্কামী। তাই এই ব্রহ্মার দ্বারা তোমাদের সমগ্র বিশ্বের মালিক বানিয়ে, উনি স্বয়ং বানপ্রস্থে গিয়ে বসে থাকেন। লোকেরা নিজেরাই কিন্তু তা কীর্তন করে -"দুঃখে সবাই স্মরণ করে, সুখে করে না কেউ ....." অর্থাৎ ভক্তরাও সব কিন্তু সেই একই ভগবানকে স্মরণ করে। তবুও আবার ভগবানকে সর্বব্যাপী বলে। তবে আর তাদেরকে ভক্ত বলা যাবে কি প্রকারে ? যেখানে তাদের এমনই উল্টো জ্ঞান। বাবা রচনা করান মুখ-বংশাবলী বাচ্চাদেরকে। তোমরা বি.কে.-রা হলে প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ-বংশাবলী বাচ্চা। আর তথাকথিত জাগতিক ব্রাহ্মণেরা হল কুখ-বংশাবলী, অর্থাৎ (গর্ভজাত) কাম-বিকারের দ্বারা জন্ম হয় তাদের। জাগতিক তীর্থের দিশা-নির্দেশকরা হলো জাগতিক পাণ্ডা। তার তোমরা বি.কে.-রা হলে ঈশ্বরীয় পাণ্ডা। এবার বাবা সকল আত্মাদেরকেই বলছেন- "এখন তোমরা একমাত্র এই বাবাকে অর্থাৎ কেবলমাত্র আমাকেই স্মরণ করো, এমন বাবাকে কি ভুলে যাওয়া উচিত ? বাবাকেই যদি ভুলে যাও তবে তার অমূল্য সম্পদ অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্সা পাবে কি করে ? তাই বাবা আবারও বলছেন- ওঁনাকে স্মরণ করতে। বাদবাকী যা কিছুই আছে, তাও তো এই বাবারই রচনা, যা থেকে কোনও প্রকারের আশীর্ব্বাদী-বর্সা পাওয়া যায় না। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা ও সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের প্রতি।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) কর্ম-কর্তব্যের পার্ট সঠিক ভাবে করার জন্য ড্রামার রহস্যগুলিকে খুব ভালভাবে জানতে হবে। এখন আমরা জ্ঞান-ধনে ধনী, তাই কখনও নিজেদের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া মোটেই নয়।

২) গাইড হয়ে বাবা স্বয়ং এসেছেন, সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। অতএব এখন দেহ সহ সবকিছুকে ভুলে কেবলমাত্র এক ও একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করতে হবে।

বরদান :- হিম্মৎ-এর সংকল্প দ্বারা মায়াকে হিম্মৎহীন বানিয়ে হিম্মৎবান আত্মা হও

বিস্তার :- যে বাচ্চারা এক বল ও এক ভরসায় থেকে, এমন হিম্মৎ-এর সংকল্প করে যে- বিজয়ী আমাকে হতেই হবে, তখন সেই হিম্মৎবান বাচ্চাকে বাবা স্বয়ং যেন সাহায্য করছেন - সদা এমনটাই অনুভব হতে থাকে। হিম্মৎ-এর কারণেই সে বাবার সাহায্যের পাত্র হয়ে যায়। হিম্মৎ-এর সংকল্পের সামনে মায়া হিম্মৎহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু, যে এমন দুর্বল সংকল্প করে - সঠিক বুঝতে পারছি না, এটা কি সফল হবে, নাকি হবে না, আমি কি করতে পারবো নাকি করতে পারবো না - এমন সংকল্পধারীকেই মায়া আহ্বান করে। অতএব সদা উৎসাহ-উদ্দীপনা সম্পন্ন হিম্মৎ-এর সংকল্প করতে পারলে তবেই তাকে বলা যাবে হিম্মৎবান আত্মা।

স্লোগান :- নির্মাণচিত্তের আসনে বসে দ্বায়িত্বের মুকুট ধারণ করাই হলো শ্রেষ্ঠত্ব ।